রবিউল আউয়াল মাস: ঘটনাপ্রবাহ ও আমাদের শিক্ষা

মূল লেখক:সুলাইমান বিন জাসের আল-জাসের
ভাষান্তরে: আবু আব্দুল্লাহ আল হাম্মাদ আব্দুল্লাহীল হাদী
সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।

إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله.

ভূমিকা:

রবিউল আউয়াল মাসে এই উম্মতের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এসব ঘটনা মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে, বরং এ নিয়ে অনেক মতভেদও সৃষ্টি হয়েছে। এই মাসে সংঘটিত নববী সীরাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো হলো: **নবী ﷺ এর জন্ম, তাঁর মদীনায় হিজরত এবং ইন্তেকাল।** এসব ঘটনা শুধু মুসলমানদের জীবনে নয়, বরং জ্বিন ও মানুষের জীবনেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আর এই মাসে কিছু মুসলিম এমন এক বিদআতে লিপ্ত হয়েছে যা তাদের দ্বীনে অনুপ্রবেশ করেছে। তারা নবীজির জন্মকে একটি উৎসব বানিয়েছে, এর জন্য বিশেষ কিছু আচার-অনুষ্ঠান নির্ধারণ করেছে, যা কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফে সালেহীনের পথের পরিপন্থী। এমনকি এদের মধ্যে কেউ কেউ নবী ﷺ এর জন্মকে সীরাতের সবচেয়ে বড় ঘটনা বরং সমগ্র অস্তিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে মনে করে।

যদিও নবী ﷺ এর জন্মের চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো তাঁর হিজরত। আল্লাহর কৃপায় এ হিজরতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজ ও মুসলিম রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, যা দীর্ঘ শতাব্দীব্যাপী টিকে ছিল এবং মানবজাতির জন্য এক অনন্য সভ্যতা উপহার দিয়েছিল। এই ঘটনার গুরুত্বের কারণেই উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং পরবর্তী মুসলিমগণ ইসলামি ক্যালেন্ডারের সূচনা এ হিজরত থেকেই করেছিলেন।

عن الشعبي أنّ أبا موسى رضي الله عنه كتب إلى عمر رضي الله عنه: إنّه يأتينا منك كُتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر رضي الله عنه النّاس، فقال بعضهم: أرِّخ بالمبعث، وبعضهم: أرِّخ بالهجرة، فقال عمر: "الهجرة فرّقت بين الحقّ والباطل فأرّخوا بها"

ইবনু আবী শাইবা ‘আমের আশশাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু মূসা আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর কাছে লিখে পাঠালেন: ‘আপনার পক্ষ থেকে আমাদের কাছে এমন কিছু চিঠি আসে যাতে কোনো তারিখ লেখা থাকে না।’ তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষদের একত্রিত করলেন। কারো প্রস্তাব ছিল মাব‘আস তথা নবুয়তের সূচনা থেকে তারিখ নির্ধারণ করার, আবার কারো প্রস্তাব ছিল হিজরত থেকে নির্ধারণ করার। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: ‘হিজরতই হলো সেই ঘটনা, যা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য ঘটিয়েছে। তাই হিজরত থেকেই তারিখ নির্ধারণ করো।’

[আল-মুসান্নাফ ৭/২৬]

রবিউল আউয়াল মাসে নবী ﷺ এর জীবনীতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো তাঁর ইন্তেকাল। কারণ, নবী ﷺ এর ইন্তেকাল সাধারণ মানুষের মৃত্যু নয়, এমনকি অন্য নবীদের মৃত্যুর মতোও নয়। বরং তাঁর ইন্তেকালের মাধ্যমেই নবুওয়াতের ধারা চিরতরে শেষ হয়ে যায়, আসমান থেকে খবর নাযিল হওয়া এবং আল্লাহর ওহীর মাধ্যমে দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপনও বন্ধ হয়ে যায়।

নবী ﷺ মুসলিমদের উপর আসা এ মহা মুসিবতের (তাঁর ইন্তেকালের) গুরুত্বের দিকে সতর্ক করেছিলেন। তিনি বলেন:

يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزّ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدًا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشدّ عليه من مصيبتي

'হে মানুষ! মানুষের মধ্যে যে কারো বা কোনো মু'মিনের উপর যদি কোনো বিপদ আসে, তবে সে যেন আমার মৃত্যুজনিত বিপদকে স্মরণ করে তা দ্বারা সান্ত্বনা লাভ করে। কেননা আমার উম্মতের কারো উপর আমার মৃত্যুর চেয়ে বড় কোনো বিপদ আসবে না।'
(ইবনু মাজাহ-১৫৯৯; সহীহ, সহীহাহ-১১০৬)।

সিন্দী (রহ.) বলেন: 'فليتعزّ অর্থ হলো, সে যেন নিজের উপর আসা কষ্টকে হালকা করে নেয় এ মহা বিপদকে স্মরণ করার মাধ্যমে। কারণ ছোট বিপদগুলো বড় বিপদের সামনে তুচ্ছ হয়ে যায়। তাই যখন মানুষ বড় বিপদের উপর ধৈর্য ধারণ করতে পারে, তখন ছোট বিপদ নিয়ে তার দুশ্চিন্তা করা উচিত নয়।'
(হাশিয়াতুস সিন্দী 'আলা ইবনে মাজাহ, হাদীস-১৫৯৯)।

সৎকর্ম ও তাকওয়ার উপর সহযোগিতা করা, সত্যের উপর একে অপরকে উপদেশ দেওয়া এবং ধৈর্যের উপর উৎসাহিত করার জন্য নসিহত, দিকনির্দেশনা ও উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে আমি (লেখক) তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি তামীম আদ-দারী ﵁ থেকে বর্ণিত সেই হাদীসকে, যেখানে নবী ﷺ বলেছেন:

«الدِّين النَّصيحة»، قلنا: لمن؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم

'দ্বীন হলো নসিহত।' আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: কার জন্য? তিনি বললেন: 'আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিমদের নেতাদের জন্য এবং সাধারণ মানুষের জন্য।' (মুসলিম- ৫৫)।

এই হাদীস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি রবিউল আউয়াল মাস সম্পর্কে এ ছোট্ট রিসালাহ (পত্র) সংগ্রহ করেছি। মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এটিকে উপকারী করেন, এবং এটি যেন তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খাঁটি ও সঠিক হয়; অর্থাৎ, যেন তা নবী ﷺ এর সুন্নাহ অনুযায়ী হয়।

রবিউল আউয়াল এর অর্থ ও নামকরণের কারণ:

প্রথমত:

রবিউল আউয়াল এর অর্থ:

এ মাসকে রবিউল আউয়াল বলা হয়েছে, কারণ এর নামকরণ বসন্ত ঋতুতে (আরবীতে রবী) করা হয়েছিল, আর সেই নামই থেকে গেছে।

রিব্' অর্থ হলো: কারো বসতি বা স্থায়ী বসবাসের স্থান। যেমন বলা হয়: ما أوسع ربع بني فلان! অর্থাৎ, অমুক গোত্রের বসতি কতই না বিস্তৃত!

আরবীতে বলা হয়: ربعت الإبل অর্থাৎ, উট যখন কোনো বসতিতে এসে থামে ও অবস্থান করে। একইভাবে বলা হয়: جاءت الإبل روابع অর্থাৎ, উটেরা বসতিতে এসে অবস্থান করল।

ইবনুস সিকীত বলেন: ربع الرجل يربع অর্থ, মানুষ যখন কোথাও থামে ও অবস্থান করে।

আরবদের নিকট 'রবী' (বসন্ত) দুই প্রকার:

১. রবীউল-শুহুর (মাসের বসন্ত):
   এটি সফর মাসের পরের দুই মাস। আর এর জন্য শুধু এভাবেই বলা হয়: শাহরু রবীউল আউয়াল (রবিউল আউয়াল মাস) এবং শাহরু রবীউল আখির (রবিউল আখির মাস)।
২. রবীউল-আজমিনা (সময়ের বসন্ত):
   এটিও দুই প্রকার:

১. (الرّبيع الأول): যে ঋতুতে কামা (এক প্রকার উদ্ভিদ) ও ফুল জন্মে, যাকে বলা হয় রবীউল-কালা (চারার বসন্ত)।

২. (الرّبيع الثاني): যে ঋতুতে ফলমূল পাকে। কিছু লোক এটিকেই প্রথম বসন্ত বলে থাকে।

রবী' (ربيع)-এর বহুবচন:

আরবীতে রবী এর বহুবচন হলো أربعاء (আরবিআ) এবং أربعة (আরবা`আহ) যেমন نصيب (নসীব)-এর বহুবচন أنصباء (আনসবাআ) ও أنصبة (আনসিবাহ)।

ইয়াকুব (রহ.) বলেন: رَبِيعُ الْكَلَإِ (ঘাস-চারার বসন্ত)- এর বহুবচন হয় أربعة (আরবা`আহ) এবং رَبِيعُ الجَدَاوِلِ (খালের বসন্ত)-এর বহুবচন হয় أربعاء (আরবিআ)।

আর 'রবী' শব্দের আরেক অর্থ হলো: বসন্তকালের বৃষ্টি। এর থেকে বলা হয়: رَبَعَت الأرض فهي مربوعة অর্থাৎ, জমিতে বসন্তের বৃষ্টি হয়েছে, ফলে তা সতেজ হয়ে উঠেছে।

الصحيح في اللغة ٢٣٨/١، المصباح المنير ٢١٦/١، المفصل في تاريخ العرب ٢٧٥/١٥

দ্বিতীয়ত: নামকরণ (تسميته):

রবিউল আউয়াল মাসকে এ নামে ডাকার পেছনে কয়েকটি বর্ণনা এসেছে। তার মধ্যে একটি হলো আরবরা সফর মাসে অন্য গোত্রে হামলা করে যা লুটতরাজ করত, সেটাকে তারা এ মাসে (রবিউল আউয়াল) ভাগাভাগি করে নিত। কারণ সফর ছিল তাদের কাছে আক্রমণ শুরু করার প্রথম মাস, যা মুহাররম মাস শেষ হওয়ার পর থেকে শুরু হতো। তবে এটি ছিল জাহেলিয়াতের আমল। ইসলাম আগমনের পর এ ধরনের জাহেলি ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে, এবং রক্তক্ষয় বন্ধ করা হয়েছে; শুধুমাত্র শরীয়তের বিধান যেমন কিসাস ইত্যাদির প্রয়োজনে হত্যা করা বৈধ রাখা হয়েছে।

কিছু মানুষ বলেছেন, এই মাসের নামকরণ এমনও হয়েছে কারণ এই মাস ও এর পরের মাস (রবিউল আখির) উভয়েই মানুষের এবং গবাদিপশুর জন্য আরামদায়ক ও শীতল সময় হিসেবে পরিচিত ছিল। এই দুই মাস আসে এমন একটি সময়ে যা আরবরা খরিফ বলে ডাকে, এবং তারা এটিকে রবিউ বলত। আরবদের কাছে রবিউ বলতে মূলত গ্রীষ্মের শীতল সময় বোঝাত, আর গ্রীষ্ম বলতে মূলত তপ্ত সময় বোঝাত।

আরেকটি মত হলো আরবরা শীতকে দুই ভাগে ভাগ করত। প্রথম ভাগকে তারা বলত রবিউয়ুল মা' ওয়াল মাতার তথা পানি ও বৃষ্টির বসন্ত, দ্বিতীয় ভাগকে বলত রবিউয়ুল কালা তথা উদ্ভিদের বসন্ত, কারণ এই সময়ে উদ্ভিদ পূর্ণতা পেত। আসলে, আরবদের কাছে পুরো শীতই ছিল এক ধরনের রবিউ কারণ এতে ভেজা ও শিশির বেশি থাকে।

বাস্তবে, আরবদের কাছে রবি ছিল দুই রকম:

১. রবীউল-শুহুর (মাসের বসন্ত) যা সফরের পরবর্তী দুই মাস: রবিউল আউয়াল ও রবিউল আখির।

২. রবীউল-আজমিনা (সময়ের বসন্ত) যা আবার দুই ভাগে বিভক্ত:

রবিউল আউয়াল: যে ঋতুতে কামা (এক প্রকার উদ্ভিদ) ও ফুল জন্মে। আরবরা এটিকে বলত রবিউ আল-কালা অর্থাৎ পশুপশির খাবারের জন্য অনুকূল সময়।

রবিউস সানী: এটি সেই সময়, যখন ফল সংগ্রহযোগ্য হয়, কেউ কেউ এটিকে রবিউল আখির বলে, আবার কেউ কেউ আগের মতো এটিকেও রবিউল আউয়াল বলে উল্লেখ করে।

এইভাবে, **আবু আল-গাউস বলতেন:**

"আরবরা বছরকে ছয়টি ভাগে ভাগ করত: দুই মাস এর মধ্যে ছিল রবিউল আউয়াল, দুই মাস গ্রীষ্ম, দুই মাস তপ্ত গরম (قيظ), দুই মাস রবিউস সানী, দুই মাস শরৎ এবং দুই মাস শীত।"
[আল-কামুসল মুহীত, পৃষ্ঠা ৯২৮; তাজ আল-‘আরূস ২১/৩৪; লিসানুল আরব ৮/৯৯]

রবিউল আউয়াল মাসে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ:

প্রথম ঘটনা: নবী ﷺ এর জন্ম:

নবী ﷺ জন্মগ্রহণ করেছিলেন সোমবারের দিনে, যেমনটি সহীহ মুসলিমে এসেছে আবূ ক্বাতাদা আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে। যখন নবী ﷺ কে সোমবারের দিনে সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি উত্তরে বলেছিলেন: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ»

"এটি সেই দিন, যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং যেদিন আমি নবুওয়াত প্রাপ্ত হয়েছি বা আমার উপর অহী অবতীর্ণ হয়েছে।" [মুসলিম- ২৮০৪]

নবী ﷺ এর জন্মের মাস ও তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে।

- ✓ ইবনে ইসহাক বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মগ্রহণ করেছিলেন সোমবারের দিন, রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখে, হস্তি বাহিনীর বছর।" [ইবনু হিশাম: সিরাতুন নাবাবিয়া, ১/১৮৩]
- ✓ ইবনে কাসীর বলেছেন:"নবী ﷺ জন্মগ্রহণ করেছিলেন সোমবারে রবিউল আউয়ালের ২ তারিখে।
- ✓ কিছু ইতিহাসবিদের মতে ৮ তারিখ, আবার কেউ ১০ তারিখ, আবার কেউ ১২ তারিখের কথা উল্লেখ করেছেন।
- ✓ জুবায়ের বিন বাক্কার বলেছেন, জন্ম হয়েছিল রমজান মাসে, যা সুহাইলী 'আর-রওদ'-এ উল্লেখ করেছেন।" কিন্তু এটি মতটি বিরল। [ইবনে কাসীর, আল-ফুসুল ফি সিরাতির রাসূল, পৃষ্ঠা ৯]
- ✓ কিছু সূত্রে বলা হয়েছে:"রবিউল আউয়ালের ৯ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।"[আল-রাহীকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা ৪৫]

যে বছরে জন্মগ্রহণ করেছেন:

- ✓ ইবনে ইসহাক বলেছেন:" হস্তি বাহিনীর বছর (আমুল ফিল)।"
- ✓ ইবনে কাসীর বলেন:"এটি অধিকাংশ আলেমের নিকট প্রশিদ্ধ মত।"
- ✓ ইবরাহীম বিন আল-মুনযির আল-হিজ্জামী, বুখারীর উস্তাদ, বলেছেন:"এটি এমন বছর, যা নিয়ে আলিমরা কোনো সন্দেহ করেননা।"
  [সীরাত ইবনে হিশাম (১/১৮৩), আল-ফুসুল ফি সিরাতির রাসূল পৃ. ৯]
- ✓ ইমাম বাইহাকী ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন:"রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিলের বছর জন্মগ্রহণ করেছিলেন।" [দালাইলুন নুবুয়া, আল-বাইহাকী (১/১৭৫)]
- ✓ এছাড়াও ইবনে ইসহাক, আবু নুয়াঈম এবং বাইহাকী মুতাল্লিব বিন আব্দুল্লাহ বিন কাইস বিন মাখরামা থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি তার পিতা এবং দাদার থেকে বর্ণনা করেছেন:"আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিলের বছরে জন্মগ্রহণ করেছি, আমরা একসঙ্গে ছিলাম।"
  [দালাইলুন নুবুয়া, আল-বাইহাকী (১/১৭৬)]
- ✓ উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু কিয়াস বিন আশইয়াম আল-কানানী আল-লাইসীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "হে কিয়াস, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বড়?" কিয়াস উত্তর দিলেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার চেয়ে বড়, আর আমি তাঁর চেয়ে প্রবীণ!"

লক্ষ্য করুন এই ভদ্রতা, সুন্দর চরিত্র ও নম্র উত্তর! কত অনুপ্রেরণাদায়ক বক্তব্য! তিনি আরও বললেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিলের বছরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আমার মা আমাকে নিয়ে খুদকুল ফিলের কাছে গিয়েছিলেন, যা সবুজ এবং বিস্ময়কর ছিল।"[দালাইলুন নুবুয়া, আবু নুয়াঈম (১/১৭৮)]

এ অনুসারে বলা হয়

- ✓ নবী ﷺ জন্মগ্রহণ করেছেন: ফিলের পঞ্চাশ দিন পর।
- ✓ ইবনে কাসিরের মতে এটি সবচেয়ে প্রশিদ্ধ মত এবং মাসউদী ও সুহাইলী এটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। তিনি আরও বলেন যে, এটি সবচেয়ে প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য।
- ✓ অন্যদের মতে, আরো পাঁচ দিন বা আট দিনের বেশি।
- ✓ ইবনু মাসউদ ও ইবনু আসাকির আবু জাফর আল-বাকের থেকে বর্ণণা করেছেন: "হাতি বাহিনীর আগমন হয়েছিল মুহাররমের অর্ধেকে, এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্ম হয়েছিল এর ৫৫ দিন পর।" হাফেজ আল-দামিয়াতি এই বক্তব্যকে সঠিক বলেছেন।
- ✓ অন্যান্য মতামতও রয়েছে: ৪০ দিন পরে, ১ মাস ৬ দিন পরে, ১০ দিন পর, ৩০ বছর পর, ৪০ বছর পর, ৭০ বছর পর। [সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৩৩৫-৩৩৬]
- ✓ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্ম ঘটেছিল কিসরার রাজা আনো শরওয়ান-এর রাজত্বের ৪০ বছর পূর্ণ হওয়ার সময়ে। এটি প্রায় এপ্রিল মাসের ২০ বা ২২ তারিখ ৫৭১ সালের সাথে মিলে যায়।
- ✓ কেউ কেউ বলেছেন, ৫৭০ সালেও জন্ম হতে পারে। [আর-রহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪৫]
  এখান থেকে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মগ্রহণ করেছিলেন সোমবার, রাবিউল আওয়াল মাসে, ফিলের ঘটনাটির প্রথম বছর। এটাই অধিকাংশ আলেমের মত।
- ✓ ইবনু সাদ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহর মা বলেছেন: "যখন আমি তাকে জন্ম দিলাম, তখন তার জন্য এমন আলো বের হলো যা শামের প্রাসাদগুলোকে আলোকিত করেছিল।"
  [আত-তবাকাতুল কুবরা, ১/১০২]।

বর্ণিত আছে যে, রাসূলের জন্মের সময় নবুওয়াতের কিছু ইঙ্গিত ঘটেছিল। কিসরার প্রাসাদের চৌদ্দটি বারান্দা ধ্বংস হয়ে পড়েছিল, অগ্নিপূজারীদের পূজিত আগুন নিভে গিয়েছিল সাওয়া হ্রদ ডুবে যাওয়ার পর এর আশেপাশের গির্জাগুলি ভেঙে পড়ে। [আল-বাইহাকী, দালায়িলুন নবুয়্যাহ, ১/১২৬]

শাইখ আল-আলবানী (রহ.) বলেন: " প্রাসাদের কম্পন, বারান্দা ধসে পড়া, আগুন নিভিয়ে যাওয়া, মোবাদানের দর্শন এবং অন্যান্য লক্ষণ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এতে কিছুই নেই।"
[সহীহ আল-সিরাহ আল-নববিয়্যাহ,পৃষ্ঠা-১৪]
আমি বলবো (সুলাইমান ইবনে জাসের আল-জাসের): তিনি যা বোঝাতে চেয়েছিলেন, তা হল, এ সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রকাশিত হয়নি।

ডা. আকরাম জিয়া আল উমারী বলেন,"রাসূলের জন্মের রাতে জ্বিনদের চিৎকার ও তাঁর ব্যাপারে সুসংবাদ প্রদান, মক্কার প্রতিমালয়ের কিছু প্রতিমা ভেঙ্গে পড়া, কেসরার প্রাসাদ প্রকম্পিত হওয়া ও তার বারান্দা ভেঙ্গে পড়া, অগ্নিপূজকদের অগ্নি নিভে যাওয়া,সাওয়া হ্রদের শুকিয়ে যাওয়া, মোবাদানের দর্শনে আরবীয় ঘোড়াগুলি টাইগ্রিস পার হয়ে পারস্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়ার চিত্র দেখা এগুলো সবই বানোয়াট ও মিথ্যা।

এছাড়াও কিছু দুর্বল বর্ণনা এসেছে, যেমন: নবী ﷺ এর জন্মের রাতে ইয়াহুদীদের পূর্বজ্ঞান, এবং মাররে জাহরান এলাকার পাদ্রী এয়সা নবী ﷺ এর জন্ম সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া। এছাড়াও তাঁর চাচা আব্বাস বলেছিলেন যে, তিনি নবী ﷺ কে খাটে চাঁদের মতো দীপ্তিময় দেখেছেন। কিন্তু কিছু সংবাদ রয়েছে যা একে অন্যক শক্তিশালী করে, তার মধ্যে একটি হলো: যখন নবী ﷺ জন্মগ্রহণ করছিলেন, তখন তাঁর মা আমেনা একটি জ্যোতি দেখেছেন যা তাঁর থেকে বের হয়ে শামের ভূমিতে অবস্থিত বাসরার প্রাসাদগুলোকে আলোকিত করেছিল। [আস-সীরাহ আন-নবাবিয়্যাহ আস-সাহিহাহ (১/৯৮-১০১)]

যখন তাঁর মা তাঁকে জন্ম দিলেন, তখন তিনি তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে, তাঁর নাতির সংবাদ দিতে পাঠালেন। আব্দুল মুত্তালিব আনন্দিত হয়ে হাজির হলেন, নবজাতককে কাবায় নিয়ে গেলেন, আল্লাহর কাছে দোয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং তাঁর জন্য “মুহাম্মদ” নাম নির্বাচন করলেন। [ইবনু হিশাম-১/১৮৪-১৮৫]।

এই মহৎ ঘটনা থেকে শিক্ষা ও উপদেশগুলো:

এই ঘটনা মানবজাতির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা আল্লাহর ওহী অবতরণের সূচনা হিসেবে ঘটেছে, যাতে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসা যায়, একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করার শিক্ষা দেওয়া এবং শিরক ও প্রতিমা থেকে মানুষকে বিরত রাখা যায়।

এই মহৎ ঘটনার মাধ্যমে আমরা শিখি:

আল্লাহ তাঁর বান্দার যত্ন নেন, তাদের জন্য রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে সাহায্য করেন, তাদের রক্ষা ও হেফাজত করেন এবং তাদের কল্যাণ কামনা করেন।

এবং এই ঘটনার আরো একটি শিক্ষণীয় দিক হলো যে, আল্লাহ তা'য়ালা নবী ﷺ-কে এতিম ও দরিদ্র অবস্থায় নির্বাচন করেছেন, যাতে আল্লাহই তাঁর পূর্ণ তত্ত্বাবধান ও লালনপালন করেন। আল্লাহ তাঁর তত্ত্বাবধান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নবীকে প্রস্তুত করেছেন রিসালাতের জন্য, মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আল্লাহ তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন, শক্তিশালী ও সহায়ক করেছেন, এবং ফলশ্রুতিতে এমন একটি প্রজন্ম গড়ে উঠেছে যারা পূর্বে গবাদি পশুপালন করত, তারা হয়ে উঠল বিশ্বের নেতৃস্থানীয় জাতি। তারা সভ্যতা গড়েছে এবং একটি উম্মাহ প্রতিষ্ঠা করেছে যা চারদিক ছড়িয়ে পড়েছে এবং ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছে।

দ্বিতীয় ঘটনা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরত:

নবী ﷺ হিজরত করেছিল মক্কা মুকাররমা থেকে মদিনা মুনাওয়ারায়। তিনি মদিনায় প্রবেশ করেন ১২ই রবিউল আউয়াল ৬২২ খ্রিস্টাব্দে। মক্কা থেকে বের হয়েছিলেন বৃহস্পতিবার, যা ছিল রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম দিন এবং মদিনায় পৌঁছান ১২ তারিখ, সোমবার দুপুরে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। (২৮ জুন ৬২২ খ্রিস্টাব্দ)” [মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ ১/১৫৯]।

নবীজির হিজরত মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এক মহৎ ঘটনা; কারণ এটিই ছিল ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের প্রথম পদক্ষেপ। এজন্য কুরাইশরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল যেন এ কাজটি না ঘটে এবং নবী ﷺ মদিনায় পৌঁছাতে না পারেন।

হিজরতের ঘটনাই সাহাবাদের কাছে তাঁর জন্মের ঘটনার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর প্রমাণ হলো যখন মুসলমানদের জন্য একটি বিশেষ তারিখ নির্ধারণ করার প্রয়োজনে আলোচনা করা হলো, তখন তারা সবচেয়ে মহৎ ঘটনাগুলো বিবেচনা করলেন। ফারুকে আযম উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের সামনে দুটি বিকল্প রাখলেন হিজরত অথবা নবুওয়াত (نبوة প্রাপ্তি)। তাঁরা রাসূল ﷺ এর জন্মকে এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি যে সেটিকে ভিত্তি করে ক্যালেন্ডার নির্ধারণ করা হবে।

হিজরতের ঘটনায় পাওয়া শিক্ষা:

১. হিজরতের এই মহিমান্বিত ঘটনা ছিল ইসলামী ইতিহাসের এক বিশাল মোড় পরিবর্তনের মুহূর্ত। এটি ইতিহাসের গতিপথকে পাল্টে দিয়েছিল এবং জীবনযাত্রার ধারা ও পদ্ধতিকে পরিবর্তন করেছিল। সেই সময় মানুষ যেসব আইন, নীতি, প্রথা, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্র, বিশ্বাস-আকীদাহ, ইবাদত-বন্দেগি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অজ্ঞতা, নীচতা, ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা, হিদায়াত,

ন্যায় ও অবিচার এসবের অধীনে জীবন যাপন করত, সেসবকেই নতুনভাবে রূপান্তরিত করেছিল হিজরতের ঘটনা। [মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ ২/৪২৩]

২. হিজরত ইসলামী দাওয়াতের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর একটি। হিজরতের আগে মুসলমানরা ছিল কেবল দাওয়াতের একটি উম্মাহ, তারা মানুষকে আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছে দিত, কিন্তু তাদের কোনো রাজনৈতিক সত্তা ছিল না, যা দাঈদের রক্ষা করবে বা শত্রুদের আঘাত থেকে তাদের বাঁচাবে। কিন্তু হিজরতের পর প্রতিষ্ঠিত হলো দাওয়াতের রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রই দায়িত্ব নিলো ইসলামকে আরব উপদ্বীপের ভেতরে এবং এর বাইরেও ছড়িয়ে দেওয়ার।

৩. হিজরতের ঘটনায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, শিরকমুক্ত বিশুদ্ধ আকীদাই হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ দূর করার অন্যতম কারণ। বিশুদ্ধ আকীদারই ক্ষমতা আছে অন্তর ও আত্মাকে একত্রিত করার, যা অন্য কোনো কিছুর দ্বারা সম্ভব নয়। এরই প্রভাবে আওস ও খাজরাজের মধ্যে মিলন ঘটেছিল, বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও মমতার দরজা উন্মুক্ত হয়েছিল। [আল-হিজরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ আল-মুবারাকাহ, পৃ. ২০৫]

তৃতীয় ঘটনা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল:

নবী ﷺ এর মৃত্যু ছিল এক মহৎ ও গুরুতর ঘটনা। তাঁর ইন্তেকালের দিন নিয়ে কোনো মতভেদ নেই; সেটি ছিল রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার। অধিকাংশের মতে, সেটি ছিল ঐ মাসের ১২ তারিখ।

- ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন:"রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করলে মুসলমানরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে কেউ হতবিহ্বল হয়ে যান, এমনকি তাদের বিবেক-বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কেউ শোকে ভেঙে পড়ে বসে পড়েন, দাঁড়ানোর শক্তি পাননি। কারো জিহ্বা অবশ হয়ে যায়, কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেন। আবার কারো কারো এমন অবস্থা হয়েছিল যে তারা তাঁর মৃত্যুকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন।" [লাতায়িফুল মা'আরিফ, পৃ. ১১৪]
  রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:"তোমাদের কারো ওপর যদি কোনো বিপদ আসে, তবে সে যেন আমার মৃত্যুর বিপদকে স্মরণ করে; কেননা সেটিই সর্বশ্রেষ্ঠ (সবচেয়ে বড়) বিপদ।"
  (ইবনু মাজাহ-১৫৯৯; সহীহ, সহীহাহ-১১০৬)।
- কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:"রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্যই বলেছেন; কারণ তাঁর ইন্তেকাল এমন এক বিপদ যা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানরা যেকোনো বিপদের শিকার হলেও তার চেয়ে বড় হবে না। তাঁর ইন্তেকালের মাধ্যমেই ওহি বন্ধ হয়ে গেল, নুবুওয়াত শেষ হয়ে গেল। আরবদের বিদ্রোহ ও অন্য নানা ফেতনার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো শয়তানি শক্তির প্রকাশ হলো। সেটিই ছিল কল্যাণের প্রথম বিচ্ছেদ এবং প্রথম ঘাটতি। [তাফসীরুল কুরতুবী ২/১৭৬]
  তিনি (কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ) এখানে এক মহৎ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যা নবী ﷺ এর ইন্তেকালের মাধ্যমে শেষ হয়ে গেছে। আর সেটি হলো ওহির অবসান, যা আদম আলাইহিস সালামকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করার দিন থেকে ক্রমাগত নাযিল হয়ে আসছিল; কিন্তু নবী ﷺ এর ইন্তেকালের মাধ্যমে তা বন্ধ হয়ে গেল।

নবী ﷺ এর ইন্তেকালের পর,

دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على أم أيمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتفقدانها، فوجداها تبكي، فقال لها أبو بكر: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله، قالت: والله ما أبكي أن لا أكون أعلم ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي أنّ الوحي انقطع من السماء، فهيّجتهما على البكاء، فجعلا يبكيان

আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা উম্মু আয়মান এর কাছে গিয়ে তার খোঁজখবর নিলেন। তারা দেখলেন, তিনি কাঁদছেন। আবু বকর ؓ তাকে বললেন:"তুমি কেন কাঁদছো? আল্লাহর কাছে কি

নবীর জন্য সেরা জিনিস নেই?” তিনি বললেন:ও আল্লাহ, আমি কাঁদছি না যে আমি জানি না আল্লাহর কাছে নবীর জন্য সেরা কি আছে, বরং আমি কাঁদছি কারণ আকাশ থেকে ওহি (প্রকাশ) বন্ধ হয়ে গেছে।”এ কথায় তাদেরও কান্না আসলো, এবং তারা কাঁদতে শুরু করলেন। [সহীহ মুসলিম- ১০৩]

নবী ﷺ এর মৃত্যু ছিল উম্মাহর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা মহৎ বিপদ। এটি সাহাবাদের অন্তর ও অবস্থার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। এমনকি তাদের এই দৃশ্যকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনা সত্যি বলেন: "صار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم"

“ নবী হারানোর কারণে মুসলমানদের অবস্থা এমন হলো যে, যেন বৃষ্টি ভেজা শীতের রাতে ভেড়াগুলির মত, তারা দিশাহারা হয়ে গেল।”

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلمّا كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كلّ شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا"

“যে দিন নবী ﷺ মদিনায় প্রবেশ করেছিলেন, সে দিন শহরটি আলোকিত হয়ে ওঠে। আর যে দিন তিনি ইন্তেকাল করলেন, সেই দিন শহরটি অন্ধকারে ঢেকে গেল। আমরা তাঁর শরীর থেকে হাত সরানোর পরও আমাদের অন্তর অস্বীকার করেছিল।”

[আত-তিরমিযি (৩৬১৮), ইবনু মাজাহ (১৬৩১), সহীহ]

<u>এমন দিনে কোন উদযাপন সম্ভব? যখন উম্মাহ তার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিপদের শিকার হয়েছিল।</u>

ফাকেহানী বলেছেন: “এটি এমন এক মাসে ঘটেছে, যে মাসে নবী ﷺ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই একই মাসেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং এই মাসে আনন্দের চেয়ে শোক প্রকাশই প্রাধান্য পাওয়া উচিত।”

নবী ﷺ এর ইন্তেকালে কিছু শিক্ষা ও উপদেশ:

১. এই ঘটনা ছিল মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্মে অন্যতম বৃহৎ বিপদ। যেমন নবী ﷺ বলেছেন: “যদি তোমাদের কারো ওপর কোনো বিপদ আসে, তবে সে যেন আমার মৃত্যু স্মরণ করে; কারণ এটি সর্বশ্রেষ্ঠ বিপদ।” (আগের হাদীসের উদ্ধৃতি)
   রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথা সত্যি, কারণ তাঁর মৃত্যু কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের যে কোনো বিপদের চেয়ে বড়। তাঁর ইন্তেকালের ফলে ওহি বন্ধ হয়ে গেল, নুবুওয়াত শেষ হয়ে গেল, আরবদের বিদ্রোহ ও অন্যান্য পরিস্থিতিতে শয়তানি শক্তির প্রথম প্রকাশ ঘটল। এটি ছিল ভালো কাজের প্রথম বিচ্ছেদ এবং প্রথম ঘাটতি। [তাফসীরুল কুরতুবী ২/১৭৬]
২. তাওহীদ (একত্ববাদ) হলো মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুতর বিষয়। নবী ﷺ এটি প্রচার করতেন, দাঁড়িয়ে থাকাকালীন, বসে থাকাকালীন, এবং ঘুমানোর সময়ও। এমনকি মৃত্যুর সময়েও তিনি এই বার্তা প্রকাশ করেছিলেন। মৃত্যুর সংকটে তিনি বলেন: “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই)। এছাড়া মৃত্যুর সংকটে তিনি আরও বলেন: “আল্লাহ ধ্বংস করুন ইহুদী ও খ্রিস্টানদের, যারা নবীর কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।” [বুখারী- ৪৩৭, মুসলিম- ৫৩০]
৩. প্রতিটি মানুষ অবশ্যই মৃত্যুর সম্মুখীন হবে এবং আল্লাহর সামনে হাজির হবে। মানুষকে তার ইবাদত ও বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। নবী ﷺ মৃত্যুর বিছানায় শুয়ে বলেছেন:“সালাত, সালাত। তোমাদের অধীনস্থদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো।”[আবু দাউদ- ৫১৩৪]

এই মাসের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রধান ভুলসমূহ:

মহানবী ﷺ-এর জন্মদিন উপলক্ষে কিছু প্রধান ভুল প্রচলন:

মাওলিদ হলো জন্মের সময়। এখানে বোঝানো হয়েছে নবী ﷺ এর জন্মের সময় উৎসবের আয়োজন করা, এবং তা উদযাপন ও আনন্দ প্রকাশ করা।

মাওলিদ তথা জন্মদিন উদযাপনের বিধান:

মাওলিদ উদযাপন একটি বিদ'আহ এবং নিন্দনীয় কর্ম, যা পালনকারীর জন্য বিভ্রান্তির কারণ হয়। কারণ আল্লাহর ধর্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, ধন্যবাদ আল্লাহকে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করেছি এবং আমার অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করেছি, এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণযোগ্য করেছি।" [সূরা মায়েদাহ:৩]

- ইমাম মালিক বলেছেন:"যা কিছু ঐ দিন ধর্মে অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেটিই ধর্ম। আর যা ঐ দিন ধর্মে অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তা ধর্মের অংশ নয়।" [আল-ই'তিসাম, শাতবী ১/৪৯৪]

  এটি উদযাপন সাধারণত হয় ভোজন বা দাওয়াতের আয়োজনের মাধ্যমে, সাথে যেসব গ্রন্থ এই উদযাপনের জন্য রচিত, সেগুলো পাঠের সভা। এই সভাগুলোতে অন্তর্ভুক্ত থাকে: নবী ﷺ এর জন্মের কথা, তাঁর জীবনের অন্যান্য ঘটনা,তাঁর সুনাম, মহান গুণাবলী ও কিরাত,তাঁর পরিবার (আহলুল বয়ত) এবং তাদের নেক গুণাবলী ও কীর্তি।

  <u>নিশ্চয়ই, মাওলিদ উদযাপন বিদ'আহ হিসেবে প্রথম চালু করেছিলেন আবীদীয়রা,</u> যারা ফাতিমীয় রাষ্ট্রের শাসক ছিল; তারা কাফির ও ঈমানবিরোধী ছিলেন। এটি প্রথম তিনটি প্রিয় যুগে প্রচলিত ছিল না, তাই এটি একটি নতুন বিদ'আহ। প্রতিটি বিদ'আহ বিপথগামী, যেমন নবী ﷺ বলেছেন:"প্রতিটি বিদ'আহ বিপথগামী।" প্রতিটি নতুন উদ্ভাবিত (মুহদাস) বিষয় তার আবিস্কারকারীর জন্য প্রত্যাখ্যাত। নবী ﷺ বলেছেন:"আমাদের বিষয়ের মধ্যে যে কেউ এমন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার অংশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"

  নববী বলেছেন:"আরবরা বলেছে: الرد عنا অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত। অর্থাৎ এটি বাতিল এবং গ্রহণযোগ্য নয়।" [শারহ সাহিহ মুসলিম ১২/১৬]

  তিনি বলেছেন: "এই হাদীসটি ইসলামের একটি মহান নীতি, এবং এটি নবী ﷺ এর সংক্ষিপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বাণীর মধ্যে একটি, কারণ এটি স্পষ্টভাবে সব বিদ'আহ ও উদ্ভাবিত বিষয় প্রত্যাখ্যান করে।"

  তিনি আরও বলেন: "এই হাদীসটি সংরক্ষণ এবং ব্যবহার করা উচিত অশ্লীল বা নিন্দনীয় কাজ বাতিল করার জন্য, এবং এর দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত।" [উল্লেখিত সূত্র]

মাওলিদ উদযাপন প্রথম কারা চালু করেছিলেন:

মাকরিজী বলেছেন: "ফাতিমীয় খলিফাদের সময়ে যে দিনগুলোকে তারা উৎসব ও আনন্দের সময় হিসেবে পালন করত, সেগুলোতে জনগণের অবস্থার উন্নতি ঘটত এবং তাদের জন্য অনেক অনুগ্রহ আসত। ফাতিমীয় খলিফাদের পুরো বছরের মধ্যে বিভিন্ন উৎসব ও মরসুম ছিল, যেমন: নবী ﷺ এর জন্মদিন, আলী ইবনে আবি তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর জন্মদিন,হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমার জন্মদিন,ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জন্মদিন, বর্তমান খলিফার জন্মদিন, রজব মাসের প্রথম রাত,শাবান মাসের প্রথম রাত, মাসের অর্ধেকের রাত এভাবে তিনি অন্যান্য উৎসব ও মরসুমের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। [আল-খুতুত ১/৪৯০]

এই ঘটনাটিকে ফাতিমীয়দের সঙ্গে সম্পর্কিত করার বিষয়টি সমকালীনরা নিশ্চিত করেছেন, বিশেষ করে মিশরের মুফতি শাইখ মুহাম্মাদ বখীত আল-মাতিয়ি হানফি (মৃত্যু: ১৩৫৪ হিজরী)। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, এর সূচনা নির্দিষ্টভাবে ফাতিমীয় শাসক আল-মুযিয্ লি দীনিল্লাহ-এর সময়েই

হয়েছে।" [আহসানুল কালাম ফিমা ইয়াতায়াল্লাকু বিস সুন্নাহ ওয়াল বিদ'আহ মিনাল-আহকাম, মুহাম্মাদ বখীত, পৃ. ৪৪-৪৫]
শাইখ মুহাম্মাদ বখীত আল-মাতিয়ি হানফি এবং উস্তাজ আলী মাহফুজ একমত যে, ফাতিমীয়দের পর সপ্তম শতকে মালিক আল-মুজাফফর আবু সাঈদ ইরবিল শহরে নবীজির মাওলিদ উদযাপন শুরু করেছিলেন।" [আহসানুল কালাম, পৃ. ৫২; আল-ইবদা' ফি মাজারিল ইবতিদা', আলী মাহফুজ, পৃ. ১২৬]
এই ফাতিমীয়দের আহলুল বায়তের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে কোনো বিশ্বস্ত আলেম স্বীকার করেননি। বরং তারা আহলুল বায়তকে কলঙ্কিত করার জন্য গ্রন্থ ও আলোচনার ব্যবস্থা করেছে এবং তাদের ওপর কুফর, জাহেলিয়্যাহ ও অনৈতিকতার সাক্ষ্য প্রদান করেছে।
বাকালানী বলেছেন: "তারা এমন লোক যাদেরকে প্রকাশ্যে রাফিযি মনে করা হয়, কিন্তু অন্তরে বিশুদ্ধ কুফর লুকিয়ে রাখে।" [ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১১/৩৮৭]

ফাতিমীয়রা এই উদযাপনে যে নিন্দনীয় কাজগুলো করত, সেগুলো মাকরিজী তার 'আল-খুতুত'-এ উল্লেখ করেছেন। শাইখ মুহাম্মাদ বখীত আল-মাতিয়ি মন্তব্য করেছেন: "আপনি যদি জানেন ফাতিমীয়রা নবীজির মাওলিদ উদযাপনে কী করত, তবে আপনি নিশ্চিত হবেন যে তা কখনও বৈধ বা হালাল হিসেবে গণ্য হতে পারে না।" [আহসানুল কালাম, পৃ. ৫২]

নিশ্চয়ই এই উদযাপন তিনটি প্রিয় যুগের পর উদ্ভাবিত হয়েছে। যারা এটি চালু করেছে, তারা ইসলামের সঙ্গে যুক্ত সবচেয়ে মন্দ এবং কুফরপ্রবণ দলগুলোর মধ্যে শামিল ছিল। তারা এই উদযাপনগুলো পরিচালনা করেছিল সাধারণ জনসাধারণকে প্রভাবিত করার জন্য, এই ধারণা করে যে এই মাওলিদ উদযাপন তাদের অবৈধ বংশকে শক্তিশালী করবে। তারা এতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিল। মানুষ সেই বিশাল ভোজের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিল, যা তাদের জন্য প্রস্তুত করা হতো, এবং প্রত্যেক বছর আগ্রহভরে এর অপেক্ষায় থাকত। এভাবে বছর বছর এটি চলতে থাকল এবং মানুষ এতে অভ্যস্ত হয়ে গেল। এতে এমন বিশ্বাস তৈরি হলো যা নিয়ে বয়স্করা মৃত্যুবরণ করতো, আর ছোটরা সেই বিশ্বাসে বড় হতো।
যদিও আবীদ বংশের রাষ্ট্র শেষ হয়ে গেল, কিন্তু এই উদযাপন অব্যাহত থাকল, শুধুমাত্র যারা আল্লাহর দিকনির্দেশনা মেনে তাঁর কিতাব ও নবীর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরেছিল তাদের অবস্থা ব্যতিক্রম।"
"মাওলিদ উদযাপনের নিন্দনীয় দিকের মধ্যে একটি অদ্ভুত ঘটনা হলো সুয়ুতী তার আল-হাবি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: "মালিক আল-মুজাফফর, যিনি মাওলিদ উদ্ভাবন করেছিলেন এটি তিনি আবীদ বংশের শাসকদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। একটি মাওলিদে একটি মঞ্চ/উৎসবস্থল প্রস্তুত করেছিলেন। সেখানে তিনি স্থাপন করেছিলেন: ৫,০০০ টি ভুনা ভেড়ার মাথা, ১০,০০০ টি মুরগি, ১০০ টি ঘোড়া, ১০০,০০০ টি দুধের পাত্র, ৩০,০০০ টি মিষ্টির থালা। তিনি সেখানে সুফিদের জন্য একটি সমাগম আয়োজন করেছিলেন দুপুর থেকে ভোর পর্যন্ত, এবং নিজেই নর্তকীদের সঙ্গে নৃত্য করতেন।" [মির'আতুজ্জামান, লিসাবৃত ইবনু আল-জাওযী, পৃ. ৬৮১-৬৮২]
শাইখ আবু বকর আল-জাজারী বলেছেন:"কীভাবে এমন উম্মাহ বাঁচতে পারে যার রাজারা দরবেশ, যিনি মিথ্যার উৎসবে নাচেন?! إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون।" [আল-ইনসাফ, পৃ. ৩৬২; প্রকাশিত 'মাওলিদ উদযাপনের বিধান সম্পর্কিত বার্তাসমূহ'-এর মধ্যে]

মিলাদে দাঁড়ানো:

মিলাদে যে দাঁড়ানো হয়, তাকে বলা হয় “ফায়া” (الفزة) এবং তাদের উদ্দেশ্য হলো দ্রুত দাঁড়ানো, যখন নবী ﷺ-এর জন্মের উল্লিখিত স্মরণ হয় এবং তিনি দুনিয়ায় আগমন করেন। এটি তাদের কাছে “হযরাহ” (الحضرة) নামেও পরিচিত; কারণ এদের মধ্যে অনেকেই দাবি করে যে, সেই সময় নবী ﷺ-এর আত্মা উপস্থিত থাকে। তারা বলে: “হযর, হযর” (حضر،حضر) এবং জানালা খোলা রাখে যেন নবী ﷺ এর আত্মা সেখানে প্রবেশ করতে পারে।

এভাবে তারা বিদআত এবং নবী ﷺ-এর সাথে অশোভন আচরণ উভয়ই মিলিয়েছে; কারণ তারা এটিকে এমন কিছুর সাথে মিলিয়েছে যা আল্লাহ তায়ালার কুরআনের নির্দেশের বিপরীত:

“আর পিছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করাতে কোনো পুণ্য নেই ; বরং পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে। কাজেই তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। [সূরা আল বাকারাহ:১৮৯]

এই দাঁড়ানো (قيام)টি পছন্দনীয় বলে উল্লেখ করেছেন রিসালাহ হাওলাল ইহতিফাল গ্রন্থের লেখক। [رسالة حول الاحتفال, পৃষ্ঠা ২৪-৩১]

যদিও নবীর ﷺ জীবদ্দশায় এটি নিষিদ্ধ এবং ঘৃণিত ছিল, এবং সাহাবীগণও এটিকে অপছন্দ করতেন। তাহলে কিভাবে এটি নবী ﷺ-এর জন্মমিলাদ উদযাপনে বিদআতী-প্রথার মধ্যে পছন্দনীয় হতে পারে?

আবু উমামাহ আল-বাহেলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন:

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئًا على عصا، فقمنا إليه، فقال:

«لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضًا»

নবী ﷺ আমাদের কাছে লাঠির উপর ভর দিয়ে বের হন, তখন আমরা তাঁর দিকে উঠে দাঁড়ালাম। তখন তিনি বললেন: “তোমরা এমনভাবে দাঁড়াবেন না যেমন অনারবরা দাঁড়িয়ে একে অপরকে সম্মান করে।” [আহমাদ-২১৬৭৭, আবু দাউদ- ৫২৩০]

আনস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"ما كان شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك"

“তাদের কাছে নবী ﷺ-এর চেয়ে প্রিয় কেউ ছিল না, এবং তারা যখন তাঁকে দেখত, তারা দাঁড়াতেন না, কারণ তারা জানতেন যে নবী ﷺ এটি অপছন্দ করতেন।” (আহমাদ-১১৯৩৬)

নবী ﷺ এই দাঁড়ানো অপছন্দ করতেন, তা নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং বলেছেন এটি অনারবদের (অন্য জাতির) আচরণ, তাহলে কীভাবে তা নবী ﷺ-এর জন্ম ও দুনিয়ায় আগমনের স্মরণে করা যায়?! এটি আরও বেশি নিষিদ্ধ, কারণ এটি বিদআত এবং অনারবদের খারাপ প্রথাকে একত্রিত করে।

এরা এখানেই থামে না, বরং দাবি করে যে নবী ﷺ-এর জন্মের স্মরণে এই দাঁড়ানো হয় যাতে নবী ﷺ -এর আত্মা সেই সময় উপস্থিত হয় এবং সভায় উপস্থিত সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এটি এমন ধারণা যা কোনো কুরআন, সুন্নাহ বা পূর্ববর্তী সৎ ব্যক্তিদের বক্তব্য দ্বারা সমর্থিত নয়।

● মিলাদে পাঠ করা শির্কপূর্ণ কবিতা:

যেসব কবিতায় স্পষ্ট শির্ক আছে, সেই ক্ষেত্রে এই লোকেরা তা কোনো সমস্যা মনে করে না; কারণ তারা মনে করে নবী ﷺ-এর হাদীস “যেমন নাসারারা ঈসা ইবনে মরিয়মকে মহিমান্বিত করে” (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم) এ ক্ষেত্রে ‘কাফ’ কেবল উদাহরণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে,

অর্থাৎ: “আমার সম্পর্কে নাসারাদের ঈসা ইবনে মরিয়মের মতো কথা বলো না (অর্থাৎ আল্লাহর পুত্র), কিন্তু অন্য যেকোনো কথাই বলতে পারো।”

এই কারণে বুসাইরি কবিতায় বলেন:

دع ما ادعته النصارى في نبيهم ** واحكم بما شئت مدحًا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف ** وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له ** حدٌّ فيعرب عنه ناطق بنعم

অনুবাদ:

“নাসারারা তাদের নবীর প্রতি যেভাবে দাবি করে, তা ছেড়ে দাও।
তুমি যেভাবেই তাকে প্রশংসা করতে চাও করো, এবং যেভাবেই চাও তার
গুণাবলীকে তার সঙ্গে যুক্ত করো। তুমি তার মর্যাদার সঙ্গে যা খুশি মহিমা যুক্ত করো,
কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফজিলতের কোনো সীমা নেই, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায়।”

সঠিক হলো যে, এই হাদিসে ব্যবহৃত ‘কাফ’ (ك) হলো কারণ নির্দেশ করার জন্য, উদাহরণের জন্য নয়, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: “যেমনভাবে আমরা তোমাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি” [আল-বাকারাহ: ১৫১]

“এবং তাকে স্মরণ করো যেমনভাবে তিনি তোমাদের পথ দেখিয়েছেন” [আল-বাকারাহ:১৯১]

নবী ﷺ তার উম্মতকে অযথা প্রশংসা ও অতিরিক্ত মহিমা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন, যাতে অতিরিক্ত মর্যাদার কারণে ঘটে যাওয়া শির্ক বা উগ্রতা এড়ানো যায়, যেমন নাসারারা করেছিলেন এবং তারা বলেছিল, “ঈসা আল্লাহর পুত্র”।

<u>এটাকে আরো স্পষ্ট করে যা আব্দুল্লাহ বিন সিখির বর্ণনা করেন,</u>

তিনি বলেন, একদা আমি বনী আমীরের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। আমরা বললাম, আপনি আমাদের নেতা। তিনি বললেন, প্রকৃত নেতা হলেন বরকতময় মহিয়ান আল্লাহ। আমরা বললাম, আপনি মর্যাদার দিক থেকে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দানের বিশালতায় আপনি মহান। তিনি বললেন, তোমাদের একথা তোমরা বলতে পারো, অথবা তোমাদের এরূপ কিছু বলায় কোনো সমস্যা নেই। তবে শয়তান যেন তোমাদেরকে তার প্রতিনিধি না বানায়। (আবু দাউদ ৪৮০৬, সহীহ)

তারা শির্কের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, এবং নবী ﷺ-এর প্রশংসা করে এমন বিষয় দ্বারা যার উপর মুশরিকদের সাথে লড়াই করেছিলেন। তাহলে তারা কতটা ভ্রান্ত এবং হেদায়াত থেকে কতটা দূরে, তা ভাবুন।

বিদআতী মিলাদ উদযাপনের ফলে উদ্ভূত প্রভাবসমূহ:

১. এমন পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদত করা যা রাসূল শরিয়ত সম্মত করেননি বরং ভ্রান্ত বলেছেন।
২. ইসলামী আইনের পরিপূর্ণতাকে অবজ্ঞা করা এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করা: (আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম) [আল-মায়িদাহ:৩ এর অংশবিশেষ]।
৩. নবী ﷺ এর আমানতদারিত্বের উপর আঘাত করা অর্থাৎ তিনি আমানত আদায় করেননি এবং উম্মতকে উপদেশ দেননি এমন ধারণা সৃষ্টি করা।
৪. এ দিনকে ঈদ বানিয়ে ফেলা, যাতে রোযা রাখা হারাম এবং নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন ফতোয়া দিয়েছেন ইবনু আব্বাদ ও ইবনু আশির, এবং আল-হাত্তাব তা ব্যাখ্যা করেছেন [মাওয়াহিবুল জালীল (২/৪০৬)-এ]।

আহমদ ইবন বাবা বলেন:"ইবনু আব্বাদ তাঁর রিসালাগুলোতে বলেছেন: আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্মদিনে সমুদ্র তীরে বের হলাম। সেখানে আমি সাইয়্যিদ আল-হাজ ইবনু আশির ও তাঁর কিছু সঙ্গীকে পেলাম। তাদের সঙ্গে খাবার ছিল, তারা তা খাচ্ছিলেন। তিনি (ইবনু আশির) আমাকে খেতে বললেন। আমি বললাম: আমি তো সিয়াম আছি। তখন সাইয়্যিদ আল-হাজ আমার দিকে অস্বস্তিকর দৃষ্টিতে তাকালেন এবং বললেন: এটি তো আনন্দ ও খুশির দিন, এ ধরনের দিনে রোযা রাখা অপছন্দনীয়, যেমন ঈদের দিনে হয়। আমি তাঁর কথাটি ভেবে দেখলাম এবং সেটিকে সত্যই পেলাম, যেন তিনি আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিলেন।" [আল-দীবাজুল মুযাহহাব ফি আ'ইয়ানিল মাযহাব, পৃ. ৭১]

৫. সাহাবাগণের প্রতি ভালোবাসার উপর আঘাত করা; কারণ তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য কোনো মীলাদ অনুষ্ঠান করেননি।

৬. খ্রিস্টানদের অনুকরণ করা তাদের ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর জন্মদিন উদযাপনের ক্ষেত্রে। সাখাবী তাঁর আত-তিবরুল মাসবুক ফি যায়লিস সুলুক (পৃষ্ঠা ১৪)-এ এ বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, যে মীলাদ উদযাপনকে নবী ﷺ এর জন্মদিনের সঙ্গে মেলানো হয়: "যদি ক্রুশের অনুসারীরা তাদের নবীর জন্মরাতকে সবচেয়ে বড় ঈদ বানিয়ে নেয়, তবে মুসলিমরা তো আরও বেশি সম্মান ও মর্যাদার উপযুক্ত।"
মল্লা আলী কারী আল-মাওরিদুর রাবিউ ফি মাওলিদিন নববী গ্রন্থে তার সমালোচনা করে বলেন: "এর জবাবে বলা যায় যে, আমাদের তো আহলে কিতাবের বিরোধিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" (পৃষ্ঠা ২৯-৩০)।

৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্মরাত লাইলাতুল কদরের থেকেও উত্তম। এ বিশ্বাস কাস্তাল্লানী আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যা (১/১৩৫-১৩৬)-তে উল্লেখ করেছেন।
কিন্তু মল্লা আলী কারী এর জবাবে আল-মাওরিদুর রাবিউ (পৃষ্ঠা ৯৭)-তে বলেছেন: "কাস্তালানী অদ্ভুত কথা বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে নবী ﷺ এর জন্মরাত লাইলাতুল কদরের থেকেও উত্তম তিনটি দিক থেকে। অথচ এ কথা একেবারে সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শ্রেষ্ঠত্ব তো কেবল ইবাদতের শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়, যেমন কুরআনের স্পষ্ট সাক্ষ্য ﴿لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ﴾
'লাইলাতুল-কদর' হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। [সূরা আল-কদর: ৩]।
কিন্তু নবী ﷺ এর জন্মরাত সম্পর্কে কুরআন থেকে, সুন্নাহ থেকে, বা উম্মাহর কোনো আলিম থেকে কোনো দলিলেই এ ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত নয়।"

৮. মীলাদুন্নবীতে অতি মাত্রায় অপচয় করা হয়। এমনকি মিসরের ফতওয়া প্রদানকারী হানাফী আলিম মুহাম্মদ বখীত আল-মুতিয়ি বলেছেন:"তুমি যদি ফাতেমীয়রা এবং মুযাফ্ফারুদ্দীন মীলাদুন্নবীতে যা করত তা জেনে নাও, তবে তুমি নিশ্চিত হবে যে এর হালাল হওয়ার হুকুম দেওয়া কখনো সম্ভব নয়।" [এ বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে]।

৯. এ বিদআতে নানান অনৈতিক কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেমন:
ক) গান এবং সঙ্গীত যন্ত্র ব্যবহার করা। ইবনু আল-হাজ বলেছেন: "তারা এতে চলেছে নিন্দনীয় প্রথার পথে, কারণ তারা সবচেয়ে বরকতময় সময়গুলোতে যা আল্লাহ বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ করেছেন, সেগুলোতে নিজেকে ব্যস্ত করে রেখেছে বিদআত ও হারাম কাজের মাধ্যমে।" [আল-কওলুল ফাসল, পৃ. ৬৫৪]। হে দল, আহমদের উম্মাহকে কে ক্ষতি করেছে এবং নষ্ট করার চেষ্টা করেছে? এটি শুধু বাজনা, বাঁশি এবং আনন্দময় সুরের মাধ্যমেই হয়েছে। তুমি কি কখনো দেখেছ এমন কোনো ইবাদত যা বিনোদনের মাধ্যমে হয়?

খ) আল্লাহর কিতাবের প্রতি অসম্মান; কারণ তারা কোরআনের পাঠকে গান ও বিনোদনের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে।

গ) যুবকদের প্রতি মুগ্ধতা; কারণ যিনি উদযাপনে গান গায়, তিনি হতে পারেন সুদর্শন, পরিপাটি পোশাকধারী ও সুন্দর আচরণের একজন যুবক।

ঘ) পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ মিলামেশা।

১০. যা ভালো তা মন্দ এবং যা মন্দ তা ভালো হিসেবে দেখানো।

১১. ভুয়া ও অগ্রহণযোগ্য হাদীস প্রচার করা, যা নবী ﷺ এর কথার মধ্যে পড়ে: "যে আমার বিরুদ্ধে জ্ঞানবশত মিথ্যা টায়, সে তার আসন জাহান্নামে করে।" (বুখারি ১০৭, মুসলিম ২) এবং অন্য কথায়: "যে আমার সম্পর্কে এমন কোনো হাদীস প্রচার করে যা স্পষ্টত মিথ্যা মনে হয়, সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।" (মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ৯)

১২. এ দিনের একটি বিশেষ সময় আছে যা কোনো বান্দা দোয়া করলে তা অবশ্যই কবুল হবে, এটি তারা কিয়াস হিসেবে শুক্রবারের দিনের সাথে মিলিয়ে ধারণা করে।

১৩. নবী ﷺ এর প্রশংসায় কবিতা পাঠ করা, যার মধ্যে স্পষ্টত শির্কী অর্থ রয়েছে। [মীলাদুন্নবী সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ফাইল, আল-মিনবার ওয়েবসাইট]

মীলাদুন্নবী উদযাপনের হুকুম সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য আলিমদের ফতোয়া:

১. সম্মানিত শায়খ আবদুল আজিজ ইবন আবদুল্লাহ ইবন বাজ رحمه الله-কে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করা হয়েছিল: "মুসলমানদের জন্য কি এটা বৈধ হবে যে, তারা ১২ রবিউল আউয়ালের রাতে মসজিদে একত্রিত হয়ে সীরাতুন্নবী স্মরণ করবে মীলাদুন্নবীর উপলক্ষে কিন্তু দিনের বেলা তা ঈদের মতো ছুটি পালন করবে না? আমরা এ বিষয়ে মতভেদে আছি; কেউ বলেন: এটি একটি 'সুন্দর বিদআত', আবার কেউ বলেন: এটি 'সুন্দর নয় এমন বিদআত'।?"

তিনি رحمه الله উত্তর দিয়েছেন এভাবে: "মুসলমানদের জন্য বৈধ নয় যে তারা ১২ রবিউল আউয়ালের রাতে নবী ﷺ এর জন্মদিন উদযাপন করবে, এবং অন্য কোনো রাতে-ও নয়। যেমনভাবে তারা অন্য কোনো ব্যাক্তির জন্মদিন উদযাপন করতে পারবে না; কারণ মীলাদ উদযাপন ধর্মে নতুন উদ্ভাবিত বিদআত। নবী ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় কখনো নিজের জন্মদিন উদযাপন করেননি, যিনি ধর্মের সম্প্রচারক এবং আল্লাহর শারীয়াহ স্থাপনকারী। তিনি এ ব্যাপারে কোনো নির্দেশ দেননি, তাঁর খলিফাগণ ও সমস্ত সাহাবাগণও এ কাজ করেননি, এবং পরবর্তী উৎকৃষ্ট যুগের তাবেঈনও এ কাজ করেনি। তাই এটি স্পষ্ট যে এটি একটি বিদআত। নবী ﷺ বলেছেন: "যে আমাদের এই ধর্মে এমন কোনো নতুন কাজ উদ্ভাবন করে যা আমাদের নির্দেশে নেই, তা বাতিল।" (বুখারি ও মুসলিম) মুসলিম ও বুখারীতে মুয়াল্লাক ভাবে এসেছে : "যে এমন কোনো কাজ করে যা আমাদের নির্দেশে নেই, তা বাতিল।" (বুখারী- ২৬৯৭, মুসলিম- ১৭১৮)"

মীলাদ উদযাপন নবী ﷺ এর নির্দেশে নয়; এটি মানুষের দ্বারা পরবর্তী যুগে ধর্মে উদ্ভাবিত। তাই এটি বাতিল। নবী ﷺ শুক্রবারের খুতবায় বলেছেন: "তারপরে সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব, সর্বোত্তম হেদায়েত হলো মুহাম্মাদ ﷺ এর হেদায়েত, আর সব কিছুর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হলো নতুন উদ্ভাবিত বিষয়। প্রতিটি বিদআতই ভ্রান্তি।" (মুসলিম- ৮৬৭; আন-নাসায়ী, শক্তিশালী সনদে আরও বর্ণিত হয়েছে: "এবং প্রতিটি ভ্রান্তি জাহান্নামে।")

নবী ﷺ এর জন্মদিন উদযাপনের প্রয়োজন নেই। বরং, নবীর সীরাত এবং তাঁর জীবনের কাহিনী যেমন জাহেলিয়্যাহ ও ইসলামের সময় সংক্রান্ত শিক্ষাদান যথেষ্ট। এটি স্কুল, মসজিদ বা অন্যান্য জায়গায় পাঠদান আকারে করা যায়, কোনো নতুন উদ্ভাবিত অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন নেই, যা আল্লাহ

বা নবী ﷺ অনুমোদন করেননি এবং যার উপর কোনো শারীয়াহ ভিত্তি নেই। আল্লাহই সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি সকল মুসলিমদের হেদায়েত ও তাওফিক দান করুন যাতে তারা শুধু সুন্নাহর উপর নির্ভর করে এবং বিদআত থেকে সতর্ক থাকে।" [মজমু' ফতোয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ, শায়খ ইবন বাজ- ৪/২৮৯]

২. সম্মানিত শায়খ মুহাম্মদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন رحمه الله-কে মীলাদ উদযাপনের হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি উত্তর দেন:

প্রথমত, নবী ﷺ এর জন্মের রাত নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। বরং কিছু আধুনিক গবেষক গবেষণা করেছেন যে, এটি রবিউল আউয়ালের নবম রাত। দ্বাদশ রাত নয়। অতএব, দ্বাদশ রাত উদযাপন করা ঐতিহাসিকভাবে কোনো ভিত্তি রাখে না।

দ্বিতীয়ত, শারীয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকে, মীলাদ উদযাপনের কোনো ভিত্তি নেই। কারণ, যদি এটি আল্লাহর শারীয়াহ থেকে হত, তবে নবী ﷺ তা পালন করতেন বা উম্মতকে তা জানাতেন। যদি নবী ﷺ তা করতেন বা জানাতেন, তবে এটি অবশ্যই সংরক্ষিত হতো, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

নিশ্চয় আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরা অবশ্যই তার সংরক্ষক [আল-হিজর: ৯]

যেহেতু এমন কিছু ঘটেনি, তাই এটা স্পষ্ট যে, এটি আল্লাহর ধর্মের অংশ নয়। আর যদি এটি আল্লাহর ধর্মের অংশ না হয়, তবে আমাদের জন্য এটি আল্লাহর প্রতি ইবাদত বা তাঁর কাছে নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে করা বৈধ নয়। যদি আল্লাহ তায়ালা পৌঁছানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট পথ স্থাপন করেছেন যা নবী ﷺ এর মাধ্যমে এসেছে তাহলে আমরা কীভাবে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কোনো পথ অবলম্বন করতে পারি যা আল্লাহর কাছে পৌঁছায়? এটি আল্লাহর প্রতি অন্যায় করা হয়, কারণ আমরা তাঁর ধর্মে এমন কিছু নতুন উদ্ভাবন করি যা তার অংশ নয়। এছাড়াও, এটি আল্লাহর কথা প্রত্যাখ্যানের সমান: (আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম) [আল-মায়িদাহ:৩ এর অংশবিশেষ]।

আমরা বলি: যদি এই উদযাপন ধর্মের পূর্ণতা বা পরিপূর্ণতার অংশ হত, তবে এটি অবশ্যই নবী ﷺ এর জীবদ্দশায় বিদ্যমান থাকতে হতো। আর যদি এটি ধর্মের পূর্ণতার অংশ না হয়, তবে এটি কখনোই ধর্মের অংশ হতে পারে না, কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। [আল-মায়িদাহ:৩]

যে কেউ দাবি করে যে এটি ধর্মের পূর্ণতার অংশ এবং এটি নবী ﷺ এর মৃত্যুর পরে উদ্ভাবিত হয়েছে, তার বক্তব্য এই কুরআনের আয়াতকে অস্বীকারের সমান।

নিশ্চয়ই, যারা নবী ﷺ এর জন্মদিন উদযাপন করে, তারা মূলত নবী ﷺ কে মহান করার উদ্দেশ্যে, তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন এবং মনোবল উদ্দীপনা করার জন্য তা করে। তারা এ উদযাপনে নবী ﷺ এর প্রতি আবেগ প্রকাশ করে।

এটি সবই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত: নবী ﷺ এর প্রতি ভালোবাসা একটি ইবাদত। এমনকি বিশ্বাস সম্পূর্ণ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত নবী ﷺ মানুষ নিজের থেকে, সন্তানের থেকে, পিতামাতার থেকে এবং সমগ্র মানুষ থেকে প্রিয় না হয়। নবী ﷺ কে সম্মান করা ইবাদত, এবং তাঁর প্রতি আবেগ উদ্দীপনা করা ধর্মের অংশ, কারণ এতে তাঁর শারীয়াহর প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং, নবী এর জন্মদিন উদযাপন যদি আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং নবী কে সম্মান করার উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে এটি একটি ইবাদত। কিন্তু যেহেতু কোনো ইবাদতে আল্লাহর ধর্মে যা নেই তা উদ্ভাবন করা অনুমোদিত নয়, তাই মীলাদ উদযাপন একটি বিদআত এবং হারাম।

এছাড়াও আমরা শুনি যে, এই উদযাপনে কিছু গুরুতর অশ্লীলতা ও নিন্দনীয় কাজ ঘটে, যা শারীয়াহ, স্বাভাবিক বুদ্ধি বা সুসংস্কৃত আচরণের দ্বারা সমর্থনযোগ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা এমন কবিতা গায় যেখানে নবী এর প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা প্রকাশ করা হয়, এমনকি তাকে আল্লাহর চেয়ে বড় উল্লেখ করা হয়। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

আরও শুনা যায় যে কিছু অজ্ঞ মুসলমান উদযাপকদের মধ্যে, যখন জন্মদিনের গল্প পড়া হয় এবং "মুস্তফা জন্মগ্রহণ করলেন" অংশে আসে, তখন তারা সবাই একসাথে দাঁড়িয়ে নবীর রুহ উপস্থিত বলে দাবি করে। এটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

এটি সুসম্বদ্ধ আচরণও নয়, কারণ নবী নিজে কখনোও তার জন্য দাঁড়াতে পছন্দ করতেন না। তাঁর সাহাবারা, যারা তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন এবং আমাদের চেয়ে অনেক বেশি শ্রদ্ধা করতেন, তিনি জীবিত অবস্থায় এমন কোনো উদযাপনে অংশ নিতেন না। তাহলে এই ধরনের কাল্পনিক কর্মকাণ্ড কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

এই বিদআত অর্থাৎ মীলাদ বিদআত তিনটি উৎকৃষ্ট যুগের পরে উদ্ভাবিত হয়েছে। এতে এমন নিন্দনীয় কাজ ঘটেছে যা ধর্মের মূল ভিত্তি ভঙ্গ করে, তদুপরি এতে পুরুষ ও মহিলাদের অযথাযথ মেলামেশা এবং অন্যান্য অনেক অনৈতিক কাজও ঘটে।

[মজমু' ফতোয়া ও রিসালাত, শায়খ মুহাম্মদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন, ফতোয়া-৩৫০]

৩. স্থায়ী গবেষণা ও ফতোয়া কমিটিকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করা হয়েছিল: "রাসূলুল্লাহ কে সম্মান করার উদ্দেশ্যে রবিউল আউয়াল মাসে নবী এর জন্মদিন উদযাপন করা কেমন?"

কমিটি নিম্নরূপ উত্তর দিয়েছে:

নবী কে সম্মান করা হলো: আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যে বার্তা নিয়ে এসেছেন তা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা, তাঁর শারীয়াহ অনুসরণ করা যথা: বিশ্বাসে, কথায়, কাজে এবং চরিত্রে এবং ধর্মে কোনো নতুন উদ্ভাবন বা বিদআত এড়ানো।

নবী এর জন্মদিন উদযাপন করা হলো এমনই একটি বিদআত। [স্থায়ী গবেষণা ও ফতোয়া কমিটি, ফতোয়া- ৩২৫৭]

কমিটি আরেকটি ফতোয়ায় বলেন: নবী এর জন্মদিন উদযাপন একটি বিদআত, কারণ নবী নিজে তা করতেন না, এবং এ কাজ করার নির্দেশও দেননি। কোনো সাহাবাও এটি করেননি, যারা নবী কে সবচেয়ে বেশি সম্মান করতেন এবং তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করতেন। সকল সঠিক পথ হলো তাঁর হেদায়েত অনুসরণ করা। নবী বলেছেন:

"যে আমাদের এই ধর্মে এমন কিছু উদ্ভাবন করে যা আমাদের নির্দেশে নেই, তা বাতিল।" [উল্লেখিত সূত্র, ফতোয়া- ৫০০৫]

নবী এর সত্যিকার ভালোবাসা:

নবী এর প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অন্যতম মূল স্তম্ভ। নবী বলেছেন:

«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من والده وولده»

" যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম, তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমানদার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার পিতামাতা ও সন্তানের চেয়ে তার কাছে প্রিয় না হই।" (মুসলিম-৪৪)

এবং তিনি আরও বলেছেন:

«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»

"তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমানদার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার সন্তানের, পিতামাতার এবং সমগ্র মানুষের চেয়ে তার কাছে প্রিয় না হই।" (বুখারি-১৫, মুসলিম- ৪৪)

ইবনু রজব বলেন:

"নবী ﷺ এর প্রতি ভালোবাসা ঈমানের মূল স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। এটি আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার সাথে মিলিত। আল্লাহ তা'আলা এটিকে তাঁর সাথে সংযুক্ত করেছেন এবং যাঁরা নবীর প্রতি ভালোবাসার চেয়ে প্রাকৃতিকভাবে প্রিয় কোনো বিষয়ড়যেমন আত্মীয়, সম্পদ, দেশ ইত্যাদিড়কে তার উপর অগ্রাধিকার দেয়, তাদের জন্য শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ

বল: যদি তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, কনিষ্ঠ আত্মীয়, অর্জিত ধন, ব্যবসা যা তোমরা ক্রয়-বিক্রয় করে লাভের আশায় ভয় পাও, বা বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করোড়সবই তোমাদের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে প্রিয় হয় এবং আল্লাহর পথে জিহাদওড়তাহলে অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ নিজের হুকুম নিয়ে আসেন। [আত-তাওবাহ: ২৪]

যখন উমর নবী ﷺ কে বলেন:

أنت أحبُّ إليّ من كل شيء إلّا من نفسي فقال: لا يا عمر، حتّى أكون أحبّ إليك من نفسك

فقال عمر: والله أنت أحبُّ إليّ من نفسي، قال :الآن يا عمر

"আপনি আমার কাছে সবকিছুর চেয়ে প্রিয়, শুধু আমার নিজের ছাড়া," তখন নবী ﷺ বললেন:"না উমর, যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে নিজের চেয়ে প্রিয় হই।" উমর বললেন: "সত্যিই, আপনি আমার কাছে নিজের চেয়ে প্রিয়।" নবী ﷺ বললেন: "এখন, হ্যাঁ উমর। (বুখারী ৬৬৩০, ফতহুল বারী, ইবনু রজব ১/৪৮)

এ ভালোবাসা শুধুমাত্র আনুগত্যের মাধ্যমে পূর্ণ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

বল: যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো; আল্লাহ তোমাদেরও ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। [সূরা আল-ইমরান: ৩১]

এর আলামত হলো নবী ﷺ এর প্রতি ভালোবাসাকে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া। বিশেষত, যখন নবী ﷺ এর আনুগত্য ও আদেশ কোনো প্রিয় বস্তু বা অন্য কোনো প্রলোভনের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করে। যদি মানুষ নবীর আদেশ ও অনুশীলনকে সেই প্রলোভনের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়, তবে এটি প্রকৃত ভালোবাসার প্রমাণ।

এ ভালোবাসা কেবল নবী ﷺ কে জানার মাধ্যমে উদ্ভূত হয়, তাঁর পরিপূর্ণতা, গুণাবলী এবং যে মহান বার্তাগুলো তিনি নিয়ে এসেছেন তা জানার মাধ্যমে। ভালোবাসার একমাত্র পথ হলো আনুগত্য, এবং তাঁর প্রতি আনুগত্যের একমাত্র পথ হলো তাঁর অনুসরণ।

ইবনু রজব বলেছেন, নবী ﷺ এর প্রতি ভালোবাসা দুটি স্তরে হয়:

- প্রথম স্তর হলো ফরজ বা বাধ্যতামূলক।

এটি হলো: নবীর আদেশ মেনে চলাড়যে সমস্ত ফরজ কার্য সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা, এবং যে সমস্ত হারাম কার্য থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তা ত্যাগ করা; নবীর যে তথ্য বা সংবাদ প্রকাশ করেছেন তা বিশ্বাস করা ও তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা; যা তিনি প্রবর্তন করেছেন তার প্রতি কোনো অসুবিধা বা দ্বিধা অনুভব না করা; সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা; হেদায়েত অন্য কোনো সূত্র থেকে গ্রহণ না করা; এবং যে কোনো কল্যাণ কামনা করা, তা কেবল নবী ﷺ এর প্রদত্ত পথ অনুসারে করা।

- দ্বিতীয় স্তর হলো মানদুব তথা প্রশংসনীয় কাজ।

এটি হলো: নবী ﷺ এর সুন্নাহ, শিষ্টাচার ও নৈতিকতায় অনুসরণ করা; তাঁর হেদায়েত ও জীবনধারায় অনুকরণ করা; পরিবারের ও ভাইদের সঙ্গে তাঁর সুন্দর আচরণ অনুকরণ করা; দৃশ্যমান নৈতিকতার চর্চা যেমন: দুনিয়ার প্রতি অকৃপণতা ও আখেরাতের প্রতি আকাঙ্ক্ষা; উদারতা, অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া, ক্ষমাশীলতা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও বিনয়ী হওয়া; অন্তরঙ্গ নৈতিকতার চর্চা যেমন: আল্লাহর প্রতি গভীর ভয়, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা, আল্লাহর হুকুমে সন্তুষ্টি, হৃদয় সর্বদা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় মনোযোগী রাখা, সততার সঙ্গে আশ্রয় নেওয়া, সমস্ত কারণ থেকে হৃদয়কে বিচ্ছিন্ন করা, হৃদয় ও জিহ্বার মাধ্যমে নবীর স্মরণে ব্যস্ত থাকা, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করা; একাকীত্বে আনন্দ পাওয়া ও আল্লাহর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সংলাপ, দোয়া করা এবং কোরআন পাঠে মনোযোগ ও চিন্তাভাবনা করা।

আবু বকর নবী ﷺ এর অনুসরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি নবীর প্রতি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা রাখতেন। তবে তিনি বা অন্যান্য সাহাবারা যারা নবীর প্রতি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা রাখতেন তারা কোনো জন্মদিন উদযাপন করতেন না এবং তারা এটিকে ভালোবাসার কোনো প্রমাণও মনে করতেন না।

ভালোবাসা শুধুমাত্র জিহ্বার দাবির মাধ্যমে হয় না, না হলে সবাই এটি দাবি করতো।

আল-হাসান আল-বাসরি رحمه الله বলেছেন: "নবীর ﷺ এর সময়ে কিছু লোক বলেছিল: 'হে মুহাম্মদ, আমরা আমাদের রবকে ভালোবাসি।' তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন:

বল: যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো; আল্লাহ তোমাদেরও ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। [সূরা আল-ইমরান: ৩১]

অতএব, নবী মুহাম্মদ ﷺ এর অনুসরণই তাঁর প্রতি ভালোবাসার চিহ্ন, এবং যারা তা অবজ্ঞা করে, তাদের জন্য শাস্তি রয়েছে।" [ইবনু জারীর, তাফসীর, ৩/২৩২]

এই আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে এটি বনু নাজরান থেকে আসা নাসারা প্রতিনিধি দলের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী মুহাম্মদ ﷺ কে নির্দেশ ছিল, যাতে তিনি নাজরানের প্রতিনিধিদের বলেন:

"যদি তোমরা ঈসা عليه السلام সম্পর্কে যে মহান কথা বলছ, তা শুধুমাত্র আল্লাহকে মহিমান্বিত করার এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের জন্য বলো, তবে মুহাম্মদ ﷺ এর অনুসরণ করো; কারণ এটি ঈসা এর ধারাবাহিকতা।" [ইবনু জারীর, তাফসীর, ৩/২৩২]

কেন আমরা নবী ﷺ-কে ভালোবাসবো?

১. আল্লাহর ইচ্ছার সম্মতি: আল্লাহ তাআলা নবী ﷺ-কে নিজ খলীল (বন্ধু) হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। তিনি ﷺ-কে সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি হিসেবে পছন্দ করেছেন, তার উপর প্রশংসা প্রকাশ

করেছেন এবং তার অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং মুসলিমের জন্য নবী ﷺ-কে ভালোবাসা বাধ্যতামূলক।

২. ঈমানের দাবি: নবী ﷺ বলেছেন, নবীর প্রতি ভালোবাসা, সম্মান এবং মর্যাদার প্রদর্শন ঈমানের অংশ। তিনি ﷺ বললেন:"নিশ্চয়ই, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, তোমাদের কেউ ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না আমি তার নিজের জীবন, সম্পদ, সন্তান এবং সকল মানুষের চেয়ে তার কাছে প্রিয় হই।"(বুখারী-১৫, মুসলিম- ৪৫)

৩. নবী ﷺ-এর প্রতি আমাদের তীব্র ভালোবাসা এবং উম্মতের প্রতি তাঁর করুণা ও দয়া: আল্লাহ তাআলা তাঁকে গুণান্বিত করেছেন:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

"অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদের যে দুঃখ-কষ্ট হয়ে থাকে তা তার জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি করুণাশীল ও অতি দয়ালু । [সূরা আত তাওবাহ: ১২৮]

সহীহ মুসলিমে এসেছে আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ﷺ কুরআনে ইবরাহীম (আঃ) এর দু'আ সম্বলিত আয়াতঃ "হে আমার প্রতিপালক। এ সকল প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে তুমি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু" (সূরা ইবরাহীম ১৪ঃ ৩৬) তিলাওয়াত করেন। আর "ঈসা (আঃ) বলেছেনঃ "তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"- (সূরা আল মায়িদাহ ৫ঃ ১১৮)। তারপর তিনি তার উভয় হাত উঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত! আর কেঁদে ফেললেন। তখন মহান আল্লাহ বললেন, হে জিবরীল! মুহাম্মাদের নিকট যাও, তোমার রব তো সবই জানেন তাকে জিজ্ঞেস কর, তিনি কাঁদছেন কেন? জিবরীল (আঃ) এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছিলেন, তা তাকে অবহিত করলেন। আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে জিবরীল! তুমি মুহাম্মাদ এর কাছে যাও এবং তাকে বল, "নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ) আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দিব, আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না"। (ইফা- ৩৯৩, ইসলামিক সেন্টারঃ ৪০৬)

৪. উম্মতকে দাওয়াত দেওয়ার প্রতি তাঁর প্রচেষ্টা এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় বের করার জন্য যে প্রচেষ্টা তিনি করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ ও সম্মানের প্রকাশ:

- ✓ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সকলের উপরে অগ্রাধিকার দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোনো বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা হুজুরাত-১) আরো বলেন,বলুন, 'তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর (আল্লাহ্র) পথে জিহাদ করারা চেয়ে বেশি প্রিয় হয় তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের সন্তানেরা, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের আপনগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরভ ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত ।' আর আল্লাহ্ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না ।" (তাওবাহ-২৪)

সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসার চিহ্ন হলো, কোনো কিছুই তার উপরে অগ্রাধিকার পাবে নাড়তা যাই হোক না কেন।

✓ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে শিষ্টাচরণ পালন: এটি সম্পন্ন হয় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর মাধ্যমে:

ক. সালাত ও সালাম প্রেরণ করা ও তাঁর প্রশংসা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً

নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। "হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।" (সূরা আহযাব-৫৬)

খ. তাঁকে উল্লেখ করার সময় শিষ্টাচার বজায় রাখা যে, নবী বা রাসূল বলা ছাড়া উল্লেখ না করা। আল্লাহ বলেন, لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً তোমরা রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের একে অপরের আহ্বানের মত গণ্য কর না; (সূরা নূর-৬৩)

গ. মসজিদে এবং তার কবরের সংস্পর্শে শিষ্টাচরণ বজায় রাখা: অর্থাৎ,অশোভন আচরণ, গালিগালাজ, উচ্চস্বরে কথা বলা ইত্যাদি এড়াতে হবে।

ঘ. তাঁর হাদিসকে সম্মান করা এবং তা শোনার ও অধ্যয়ন করার সময় ভদ্রতা ও শিষ্টাচার দেখানো, যেমন উম্মতের সালাফ ও তাদের আলেমরা হাদিসের মর্যাদা প্রদর্শন করতেন।

৫. যা তিনি জানিয়েছেন তা বিশ্বাস করা; এটি ঈমানের মূল ভিত্তি। তাঁর ﷺ অনুসরণ করা, তার আদেশ মানা এবং তার হিদায়তের আলোকে চলা। রাসুলের ﷺ প্রতি আনুগত্য তাঁর প্রতি ভালোবাসার জীবন্ত উদাহরণ উদাহরণ। এজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন: বলুন: যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর। তখন আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।
[আল ইমরান: ৩১]

৬. তাঁর ﷺ প্রতিরক্ষা করা: এটি ভালোবাসার একটি চিহ্ন। সাহাবাগণ তাঁর ﷺ প্রতি তাদের ভালোবাসার সবচেয়ে উজ্জ্বল ও প্রকৃত উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন। তারা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে রক্ষা করার জন্য নিজের অর্থ, প্রাণ এবং সন্তান উভয়ই উৎসর্গ করেছিলেন, সুখে বা দুঃখে।

মৃত্যুর পর তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিরক্ষা করার উপায়সমূহ:

১- তাঁর দাওয়াত ও রিসালতকে মানুষের যত শক্তি আছে তা দিয়ে সাহায্য করা।

২- তাঁর সুন্নাহকে রক্ষা করা, সংরক্ষণ, প্রচার এবং সুসংহত করার মাধ্যমে এবং সকল প্রকার সংশয় দূরভীত করার মাধ্যমে।

৩- সুন্নাহ প্রচার করা এবং মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া।

শেষে আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি যে, তিনি আমাদের সত্যিকার অর্থে নবী ﷺ-এর অনুসারী এবং তাঁর সুন্নাহ অনুসরণকারী বানান, যেন আমরা নবীন উদ্ভাবনে লিপ্ত না হই এবং তাঁর আদেশ মেনে চলি। আল্লাহর শান্তি ও বরকত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও সাহাবাদের উপর।